বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২০৩-২০৬
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রংপুর বিভাগের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও কোভিড-১৯ মহামারি

মোঃ মোরশেদ হোসেন*

সারসংক্ষেপ *কোভিড-১৯ মহামারি প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যের ওপর হুমকিস্বরূপ হলেও বর্তমান বিশ্বে তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেছে। এ নিবন্ধে রংপুর বিভাগের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও কোভিড- ১৯ মহামারির প্রভাব চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে মাধ্যমিক পর্যায়ের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। কারণ কোভিড- ১৯ এর ট্রান্সমিশন মেকানিজম অনুযায়ী এর প্রভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে, ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে, এর ফলে খানার গড় ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, খানার গড় ব্যয় হ্রাসের ওপর বণ্টনগত প্রভাব পড়েছে, ফলে দারিদ্র্য সংঘটন হয়েছে। রংপুর বিভাগের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। স্বাধীনতার এত বছর পরেও গড়ে উঠেনি কোনো শিল্পাঞ্চল। কোভিড- ১৯ এর কারণে এ অঞ্চলের কৃষি খাতের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে কৃষকেরা উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাননি, সার-বীজ সরবরাহ ছিল অপ্রতুল। এ অঞ্চলের অনেক কৃষক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে কৃষিশ্রমিক হিসেবে শ্রম দেন। কিন্তু চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তারা অন্য অঞ্চলে কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে নিপতিত হয়। এ অঞ্চলের অনেক স্বল্প আয়ের মানুষ রাজধানী, বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে অনানুষ্ঠানিক নানা খাতে কাজ করেন। তারা নির্মাণ শ্রমিক, রিকশা-ভ্যান চালানো, পরিবহন শ্রমিক, হোটেল-রেস্তোরাঁ, মুদি দোকান, ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। কোভিড- ১৯ এর কারণে কর্মহীন হয়ে তারা গ্রামে ফিরে এসেছেন। জুন ২০২০ এর শেষে বেসরকারি একটি উন্নয়ন সংস্থার এক গবেষণায় দেখা গেছে, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ শহর থেকে কর্মহীন হয়ে গ্রামে ফিরে গেছে এবং ৭৩ শতাংশ দরিদ্র বা হতদরিদ্র পরিবার কোভিড-১৯ এর কারণে আয়হীন হয়ে খাদ্যসংকটে ভুগেছে, ৫৩ শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন নিকট হতে অর্থ ধার করে জীবন বাচাঁচ্ছে এবং ৩৭ শতাংশ পরিবার তাদের সঞ্চিত সম্পদ বিক্রয় করে খাদ্য সংগ্রহ করছে। এ অঞ্চলের মৎস্য খামার কিংবা পোলট্রি খামারের মালিকেরা তাদের পণ্যের সরবারাহ সংকটের কারণে যথাযথ মূল্য না পাওয়ায় অনেকেই পুঁজি হারিয়েছেন। কোভিড-১৯ এর দারিদ্র্যকরণ প্রভাব ও এ অঞ্চলের যুগ যুগ ধরে চলে আসা বঞ্চনার অবসান করতে হলে প্রয়োজন কিছু স্বল্পমেয়াদি ও কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে হলো খাদ্য ও কৃষিবাজারের Supply Chain কার্যকর করা, চাকরি হারানো নতুন বেকার, দেশে ফেরত আসা প্রবাসী শ্রমিকদের স্বল্পসুদে ও সহজ*

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর; ই-মেইল: morshed122009@yahoo.com

শর্তে ঋণ দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমালিকদের প্রণোদনা দেওয়া, হতদরিদ্রদের সহায়তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো, ছয় মাসের জন্য Employment Guarantee Scheme চালু করা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম হলো রংপুর বিভাগে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিল্পায়ন করা।

মূল শব্দ *রংপুর · দারিদ্র্য · সরবরাহ ব্যবস্থা · কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য · সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি · খাদ্য সংকট*

কোভিড-১৯ ও বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৯-এ সর্বপ্রথম চীনে কোভিড-১৯ চিহ্নিত হয়। এই মহামারি প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যের ওপর হুমকিস্বরূপ হলেও বর্তমানে তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি বর্তমানে ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে বহুমুখী সংকটের সৃষ্টি করেছে। কোভিড- ১৯ এর ফলে ২০২০ সালে বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যাবে বলে অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা। তাই আসন্ন মন্দার আশঙ্কায় কম্পমান বিশ্ব অর্থনীতি। অর্থনৈতিক সংকোচনের কারণে বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের দরিদ্র হওয়ার আশঙ্কাও এখন বাস্তবতা। ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের যে প্রচেষ্টা বৈশ্বিকভাবে অর্জন হচ্ছিল, তা অনেকটাই হোঁচট খাবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে ১ ও ২ নম্বর লক্ষ্য দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণের প্রচেষ্টা অর্জনে পিছিয়ে পড়বে বিশ্ব।

বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ তার ভয়াল থাবা বসিয়েছে। বাংলাদেশে মার্চ ২০২০ এ সর্বপ্রথম কোভিড-১৯ চিহ্নিত হয়। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, দুই মাসের সাধারণ ছুটি, দেশে ও আর্ন্তজাতিকভাবে লকডাউন, পরিবহন-যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, উৎপাদন বন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দায় বিশ্বের প্রতিটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জিডিপি পরিমাপের ১৫টি খাতের মধ্যে প্রায় সব খাতই যেমন কৃষি, মৎস্য, শিল্প, (ম্যানুফেকচারিং), নির্মাণ, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, রিয়াল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা , কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে তা ৫.২৪ শতাংশ অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ স্থির মূল্যে জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২৭ লাখ ৯৬ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা। যদিও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল ২০১৯-২০ সালে বাংলাদেশে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ২-৩ শতাংশ এবং আইএমএফ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৩.৮ শতাংশ।

কোভিড-১৯ ও রংপুর বিভাগের দারিদ্র্য

কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। কারণ কোভিড- ১৯ এর ট্রান্সমিশন মেকানিজম (Transmission Mechanism) অনুযায়ী, কোভিড-১৯ এর প্রভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে (Declining Economic Activity), ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে (Declining Economic Growth), এর ফলে খানার গড় ব্যয় হ্রাস পেয়েছে (Declining Average Household Expenditure), খানার গড় ব্যয় হ্রাসের ওপর বণ্টনগত প্রভাব পড়েছে (Distributional Impact on Household Expenditure) ফলে দারিদ্র্য সংঘটন হয়েছে (Poverty incidence)। সেন্টার

ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এক গবেষণায় দেখিয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশে ২০১৬ সালের যে উচ্চ দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.৩ শতাংশ, তা ২০২০ সালে ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে জিনি সহগ দিয়ে পরিমাপকৃত আয় বৈষম্য ২০১৬ সালে ছিল ০.৪৮, তা ২০২০ সালে ০.৫২ হয়েছে এবং ভোগ বৈষম্য ২০১৬ সালে ছিল ০.৩২, যা ২০২০ সালে ০.৩৫ হয়েছে। বলা হচ্ছে প্রায় ১৬.৫ মিলিয়ন মানুষ কোভিড- ১৯ এর কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে এসেছে, এর মধ্যে ৫ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে এসেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শেষে উচ্চ দারিদ্র্যের হার ছিল ২০.৫ শতাংশ। সে হিসাবে দেখা যায়, কোভিড-১৯ এর কারণে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে। সানেমের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৬-১২ মিলিয়ন মানুষ কোভিড-১৯ এর কারণে তাদের চাকরি হারিয়েছে। ব্র্যাকের গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিড-১৯ এর কারণে ৭৪ শতাংশ পরিবারের আয় কমে গেছে এবং ১.৪ মিলিয়নের বেশি অভিবাসী শ্রমিক তাদের চাকরি হারিয়েছে এবং দেশে ফিরে এসেছে।

কোভিড- ১৯ এ প্রভাবে রংপুর বিভাগে সৃষ্টি হচ্ছে অনেক নতুন দারিদ্র্য। আন্তর্জাতিক ও জাতীয়পর্যায়ে যখন দারিদ্র্য বেড়েছে, তখন বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরো শোচনীয়। কারণ রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার আগে থেকে অনেক বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'খানা আয়-ব্যয় জরীপ-২০১৬' অনুসারে জাতীয়পর্যায়ে দারিদ্র্য হার যেখানে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুসারে ২৪.৩ শতাংশ, সেখানে সব বিভাগের মধ্যে রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য হার সবচেয়ে বেশি ৪৭.২ শতাংশ। উল্লেখ্য খানা আয়-ব্যয় জরীপ- ২০১০' অনুযায়ী রংপুর বিভাগে ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪২.৩ শতাংশ। দেশের জাতীয় দারিদ্র্য হার যেখানে কমছে, অন্য বিভাগগুলোতে দারিদ্র্যের হার কমছে, তখন রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক বিষয় এবং পরিসংখ্যানটা চমকে দেওয়ার মতো। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জেলাভিত্তিক দারিদ্র্য পরিসংখ্যান আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য সীমাভুক্ত ১০টি জেলার মধ্যে ৫টি উত্তরাঞ্চলের। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে দারিদ্র্যের হার সর্বোচ্চ ৭০.৮ শতাংশ। কোভিড-১৯ নতুন করে এ দারিদ্র্যের হার বাড়িয়ে দিয়েছে।

রংপুর বিভাগের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। স্বাধীনতার এত বছর পরেও গড়ে উঠেনি কোনো শিল্পাঞ্চল। কোভিড- ১৯ এর কারণে এ অঞ্চলের কৃষি খাতের Supply Chain ভেঙ্গে পড়ার কারণে কৃষকেরা উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পায়নি, সার-বীজ সরবরাহ ছিল অপ্রতুল। এ অঞ্চলের অনেক কৃষক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে কৃষিশ্রমিক হিসেবে শ্রম দেন। কিন্তু চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তারা অন্য অঞ্চলে গিয়ে কাজ করতে ব্যর্থ হন। ফলে নিদারুণ অর্থকষ্টে নিপতিত হন। এ অঞ্চলের অনেক স্বল্প আয়ের মানুষ রাজধানী, বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে অনানুষ্ঠানিক নানা খাতে কাজ করে যেমন নির্মাণশ্রমিক, রিকশা-ভ্যান চালানো, পরিবহন শ্রমিক, হোটেল-রেস্তোরাঁ, মুদি দোকান, ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ। কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মহীন হয়ে তারা গ্রামে ফিরে এসেছে। জুন ২০২০ এর শেষে বেসরকারি একটি উন্নয়ন সংস্থার এক গবেষণায় দেখা গেছে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ শহর থেকে কর্মহীন হয়ে গ্রামে ফিরে গেছে এবং ৭৩ শতাংশ দরিদ্র বা হতদরিদ্র পরিবার কোভিড-১৯ এর কারণে আয়হীন হয়ে খাদ্যসংকটে ভুগছে, ৫৩ শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির নিকট হতে অর্থ ধার করে জীবন বাচাঁচ্ছে এবং ৩৭ শতাংশ পরিবার তাদের সঞ্চিত সম্পদ বিক্রয় করে খাদ্য সংগ্রহ করছে। এ অঞ্চলের মৎস খামার কিংবা পোলট্রি খামারের মালিকেরা তাদের

পণ্যের সরবারাহ সংকটের কারণে যথাযথ মূল্য না পাওয়ায় অনেকেই পুঁজি হারিয়েছেন। যারা সাধারণ ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী কিংবা পণ্য সরবরাহকারী তারাও পণ্য বিক্রয় কম হওয়ায় পুঁজি সংকটে পড়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের মালিকেরা উৎপাদন ব্যাহত, পণ্য বিক্রয় না হওয়া, কারখানা বন্ধ, কর্মী সংকট ইত্যাদি নানা কারণে লোকসানের সম্মুখীন হয়ে পুঁজি সংকটে পড়েছে। রংপুর বিভাগের বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা এমনিতেই অন্যান্য বিভাগ হতে তুলনামূলকভাবে কম, ২০০৫-২০১৮ সময়কালে মোট বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাত্র ১.৭৪ শতাংশ, রেমিটেন্স প্রাপ্তি ০.৮৫ শতাংশ। এসব শ্রমিকদের অনেকেই চাকরি হারিয়ে দেশে ফেরত এসেছেন। তারা আবার বিদেশে ফেরত যেতে পারবেন কিন া তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যারা বিদেশে গিয়ে কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়ায় ছিল তারাও এখন হতাশ। সরকারের সাধারণ ছুটি ঘোষণার সময়কালে যে ত্রাণসহায়তা, নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে তা অপ্রতুল। সরকারের ঘোষিত ২০২০-২১ সালের বাজেটের কৃষি খাতের ৯৫০০ কোটি টাকার ভর্তুকির হয়তো খুব সামান্যই পাবে এ এলাকার প্রকৃত কৃষক। ব্যাংকগুলো ঋণসহায়তা করলেও এ অঞ্চলের তরণদের উদ্যোক্তা হওয়ার প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, আগ্রহ না থাকায় স্টার্ট আপ সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলত পরস্পর নির্ভরশীল। 'একজনের ব্যয়, আরেক জনের আয়'—এই তত্ত্ব মেনে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চলে। ফলে কোনো পর্যায়ে ব্যয় বন্ধ হলে তা গুণক প্রক্রিয়ায় (Multiplier Process) সব ব্যক্তি ও খাতকে প্রভাবিত করে। কোভিড- ১৯ এর মহামারির ফলে সেই প্রক্রিয়ায় মানুষ আয়হীন, কর্মহীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সুপারিশ ও উপসংহার

কোভিড-১৯ এর দারিদ্র্যকরণ প্রভাব এবং এ অঞ্চলের যুগ যুগ ধরে চলে আসা বঞ্চনার অবসান করতে হলে প্রয়োজন কিছু স্বল্পমেয়াদি ও কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে হলো খাদ্য ও কৃষিবাজারের সরবরাহ ব্যবস্থা কার্যকর করা, চাকরি হারানো নতুন বেকার, দেশে ফেরত আসা প্রবাসী শ্রমিকদের স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমালিকদের প্রণোদনা দেওয়া, হতদরিদ্রদের সহায়তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো, ছয় মাসের জন্য এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম হলো রংপুর বিভাগে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিল্পায়ন করা। রংপুর বিভাগে ৯টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন পেয়েছে, অন্যগুলো প্রস্তাবনা পর্যায়ে রয়ে গেছে। এ বিশেষ অর্থনেতিক অঞ্চলগুলো দ্রুত প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের তরুণদের সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও ঋণসহায়তা দিয়ে উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, তেমনি কমতো দারিদ্র্য। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা হলে এ অঞ্চলের কৃষিখাতেরও উন্নয়ন হতো। বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানারসের (বিআইপি) এক গবেষণায় দেখা যায়, দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অনেক কম অংশ বরাদ্দ করা হয় রংপুর বিভাগের জন্য, ২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপিতে রংপুর বিভাগের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩.১৩ শতাংশ, যেখানে ঢাকা বিভাগের বরাদ্দ ছিল ৩৮.৫৪ শতাংশ। রংপুর বিভাগের এ বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। রংপুর বিভাগের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এডিপিতে ন্যায্য বরাদ্দ ছাড়াও বিশেষ বরাদ্দ তাই এখন কোভিড-১৯ পরবর্তী বাস্তবতা।